পারবে যে, আল্লাহ্‌র কথাই সত্য ছিল (যা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে বলা হয়েছিল এবং শিরকের দাবী মিথ্যা ছিল।) তারা (দুনিয়াতে) যেসব কথাবার্তা গড়ত, (আজ) সে-গুলোর কোন পাত্তা থাকবে না (কেননা সত্য প্রকাশের সাথে মিথ্যা উধাও হয়ে যাওয়া অবধারিত)।

জ্ঞাতব্য ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে مَاذَا أَجَبْتُمْ বলে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তোমরা পয়গম্বরগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? এখানে স্বয়ং পয়গম্বরগণ দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়ানো উদ্দেশ্য। কাজেই একই প্রশ্ন বারবার করা হয়নি।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ
مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ
قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا
آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ
أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ
أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۙ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ
عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا
بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ۝٨١ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ
تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ
بِنَا ۭ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨٢

(৭৬) কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না। (৭৭) আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৭৮) সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধনসম্পদে অধিক প্রাচুর্যশালী? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (৭৯) অতঃপর কারূন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারূন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেওয়া হত! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান (৮০) আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মী, তাদের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী। (৮১) অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না। (৮২) গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যূষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ্ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন ও হ্রাস করেন। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফিররা সফলকাম হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কারূন (-এর অবস্থা দেখ, কুফর ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে তার কি ক্ষতি হয়ে গেল! তার ধন-সম্পত্তি তার কোন উপকারে আসল না; বরং তার সাথে সাথে

তার ধন-সম্পত্তিও বরবাদ হয়ে গেল। তার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই ঃ সে) মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। [বরং তাঁর চাচাত ভাই ছিল (দুররে মনসূর)। অতপর সে (ধন-সম্পদের আধিক্য হেতু) তাদের প্রতি অহংকার করতে লাগল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। (চাবিই যখন এত বেশি ছিল, তখন ধন-ভাণ্ডার যে কি পরিমাণ হবে, তা সহজেই অনুমেয়। সে এই বড়াই তখন করেছিল,) যখন তার সম্প্রদায় (বোঝানোর জন্য) তাকে বলল, দম্ভ করো না। আল্লাহ্ তা'আলা দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। (আরও বলল,) তোমাকে আল্লাহ্ যা দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালও অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ (নিয়ে যাওয়া) ভুলে যেয়ো না। (وَلَا تَنْسَ وَ ابْتَغِ --এর উদ্দেশ্য এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও (বান্দাদের প্রতি) অনুগ্রহ কর এবং (আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও জরুরী দায়িত্ব নষ্ট করে) পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। (অর্থাৎ গোনাহ করলে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ --বিশেষ করে সংক্রামক গোনাহ্ করলে) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। [এসব উপদেশ মুসলমানদের পক্ষ থেকে হয়েছিল। সম্ভবত মূসা (আ) এই বিষয়বস্তু প্রথমে বলেছিলেন। অতঃপর অন্য মুসলমানগণও তার পুনরাবৃত্তি করেছিল]। কারূণ (একথা শুনে) বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। (অর্থাৎ আমি জীবিকা উপার্জনের নিয়মপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছি। এর বলেই আমি অগাধ ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছি। কাজেই আমার দম্ভ অহেতুক নয়। একে অদৃশ্য অনুগ্রহও বলা যায় না এবং এতে কারও ভাগ বসানোরও অধিকার নেই। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা তার দাবি খণ্ডন করেন,) সে কি (খবর পরম্পরা থেকে একথা) জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা (আর্থিক) শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং জনবলে ছিল তার চাইতে প্রাচুর্যশালী ? (তাদের শুধু ধ্বংস হওয়াই শেষ নয়; বরং কুফরের কারণে এবং আল্লাহ্ তা'আলার তা জানা থাকার কারণে কিয়ামতেও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। সেখানকার রীতি এই যে,) পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে (অর্থাৎ তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে) জিজ্ঞাসা করতে হবে না। (কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সব জানেন। তবে শাসানোর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করা হবে; যেমন বলা হয়েছে لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ --উদ্দেশ্য এই যে, কারূন এই বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে এমন মূর্খতার কথা বলত না। কেননা, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের আযাবের অবস্থা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান এবং পরকালীন

হিসাব-নিকাশ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে নিজের জ্ঞান-গরিমার ফলশ্রুতি বলার অধিকার কার আছে?) অতপর (একবার) কারূন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। (তার সম্প্রদায়ের) যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, (যদিও তারা ঈমানদার ছিল; যেমন পরবর্তী বাক্য وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الخ থেকে বোঝা যায়।) তারা বলল, আহা! কারূন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হত! বাস্তবিকই সে বড় ভাগ্যবান। (এটা ছিল লোভ। এর কারণে কাফির হওয়া জরুরী হয় না। যেমন আজকালও কতক মুসলমান বিজাতির উন্নতি দেখে দিবারাত্র লোভ করতে থাকে এবং এই চেষ্টায়ই ব্যাপৃত থাকে।) আর যারা (ধর্মের) জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা (লোভীদেরকে) বলল, ধিক তোমাদেরকে, (তোমরা দুনিয়ার পেছনে যাচ্ছ কেন?) যারা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সওয়াবই শ্রেষ্ঠ। (ঈমানদার ও সৎকর্মীদের মধ্যেও) এটা (পুরাপুরি) তারাই পায়, যারা (দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে) সবর করে। (সুতরাং তোমরা ঈমান পূর্ণ কর এবং সৎকর্ম অর্জন কর। সীমার ভেতরে থেকে দুনিয়া অর্জন কর এবং অতিরিক্ত লোভ-লালসা থেকে সবর কর।) অতপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে (তার ঔদ্ধত্যের কারণে) ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে তাকে আল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব) থেকে রক্ষা করত (যদিও সে জনবলে বলীয়ান ছিল।) এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না। গতকল্য (অর্থাৎ নিকট অতীতে) যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা (আজ তাকে ভূগর্ভে বিলীন হতে দেখে) বলল, হায় (মনে হয় সচ্ছলতা ও অভাব-অনটন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ওপর ভিত্তিশীল নয়, বরং এটা সৃষ্টিগত রহস্যের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র করতলগত।) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) হ্রাস করেন। (আমরা ভুলবশত একে সৌভাগ্য মনে করতাম। আমাদের তওবা! বাস্তবিকই) আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ না থাকলে তিনি আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। (কেননা লোভ ও দুনিয়াপ্রীতির গোনাহে আমরাও লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম।) ব্যস বোঝা গেল, কাফিররা সফলকাম হবে না (ক্ষণকাল মজা লুটলেও পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রকৃত সাফল্য ঈমানদাররাই পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফিরাউন ও ফিরাউন-বংশীয়দের সাথে মূসা (আ)-র একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারূনের সাথে তাঁর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার ধনসম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহব্বতে

ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়ঃ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الخ

---কারূনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধনসম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃতঘ্নতা করে এবং ধনসম্পদে ফকির-মিসকীনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধন-ভাণ্ডার সহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেওয়া হয়।

قَارُون---সম্ভবত হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কোরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে হযরত মূসা (আ)-র সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূসা (আ)-র সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে মূসা (আ)-র চাচাত ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরও উক্তি আছে।---(কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী)

রূহুল মা'আনীতে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কারূন তওরাতের হাফিয ছিল এবং অন্য সবার চাইতে বেশি তার তওরাত মুখস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হল। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ। মূসা (আ) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাঈলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হারূন (আ) ছিলেন তাঁর উযির ও নবুয়তের অংশীদার। এতে কারূনের মনে হিংসা জাগে যে, আমিও তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে মূসা (আ)-র কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোন হাত নেই। কিন্তু কারূন এতে সন্তুষ্ট হল না এবং মূসা (আ)-র প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠল।

بَغَى---فَبَغَى عَلَيْهِمْ কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ জুলুম করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধনসম্পদের নেশায় অপরের প্রতি জুলুম করতে লাগল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালাম ও সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, কারূন ছিল বিত্তশালী। ফিরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে বনী ইসরাঈলের ওপর নির্যাতন চালায়।---(কুরতুবী)

এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কারূন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইসরাঈলের মুকাবিলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ—كنوز শব্দটি كنز-এর বহুবচন। এর অর্থ ভূগর্ভস্থ ধনভাণ্ডার। শরীয়তের পরিভাষায় كنز এমন ধনভাণ্ডারকে বলা হয়, যার যাকাত দেওয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারূন হযরত ইউসুফ (আ)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছিল।—(রূহ্)

لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ—ناء শব্দের অর্থ বোঝার ভারে ঝুঁকিয়ে দেওয়া। عصبة শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ধনভাণ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত অধিক সংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলা বাহুল্য, চাবি সাধারণত হালকা ওজনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক হওয়ার কারণে কারূনের চাবির ওজন এত বেশি ছিল, যা একদল লোকও সহজে বহন করতে পারত না।—(রূহ্)

لَا تَفْرَحْ—فرح-এর শাব্দিক অর্থ আনন্দ, উল্লাস। কোরআন পাক অনেক আয়াতে এই فرح-কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে ঃ যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ—অন্য এক আয়াতে আছে لَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ আরও এক আয়াতে আছে ঃ فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا—কিন্তু কোন কোন আয়াতে এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও বর্ণিত আছে, যেমন يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াতে এবং فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا আয়াতে। এসব আয়াতের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আনন্দ ও উল্লাস নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ, যা দম্ভ ও অহংকারের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয়—আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না, তা নিষিদ্ধ নয় বরং একদিক দিয়ে কাম্য। কারণ, এতে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

—অর্থাৎ ঈমানদারগণ কারূনকে এই উপদেশ দিল, আল্লাহ্ তোমাকে যে অর্থ-সম্পদ

দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালীন শান্তির ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভুলে যেয়ো না।

দুনিয়ার অংশ কি? এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর অর্থ দুনিয়ার বয়স এবং এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা পরকালে কাজে আসতে পারে। সদ্‌কা, খয়রাতসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস সহ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে।---(কুরতুবী) এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি--- এগুলোকে পরকালের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই, যতটুকু পরকালের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিসদের প্রাপ্য। কোন কোন তফসীরকার বলেন, দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন, তদ্দ্বারা পরকালের ব্যবস্থা কর; কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্য রাখ। এই তফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বোঝানো হয়েছে। واللہ اعلم

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي---কারও কারও মতে এখানে 'ইল্‌ম' বলে তওরাতের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কারূন তওরাতের হাফিয ও আলিম ছিল। মূসা (আ) যে সত্তরজনকে তূর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, কারূন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরোক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে ইল্‌ম বলে 'অর্থনৈতিক কলাকৌশল' বোঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি।' উদ্দেশ্য এই যে আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের কোন দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারূন একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য--- এগুলোও তো আল্লাহ্ তা'আলারই দান ছিল;---তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না।

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ---কারূনের উপরোক্ত উক্তির আসল জওয়াব তো তা-ই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তোমার ধনসম্পদ তোমার বিশেষ কর্ম তৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না।

কেননা এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ্ তা'আলার দান। এই জওয়াব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কোরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। অর্থের প্রাচুর্য কোন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসাবে কোরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবেরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ —এই আয়াতে الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ আলিমদের মুকাবিলায় —— الْعِلْمَ

বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলিমদের কাজ নয়। আলিমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۭ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ مَنْ جَاۗءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَاۗءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

---

(৮৩) এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম।
(৮৪) যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা সে মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই পরকাল (যার সওয়াব যে উদ্দেশ্য, তা ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ বাক্যে বর্ণিত

হয়েছে) আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়াতে উদ্ধত্য হতে এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। (অর্থাৎ অহংকার তথা গোপন গোনাহ করে না এবং কোন প্রকাশ্য গোনাহেও লিপ্ত হয় না, যদ্দ্বারা দুনিয়াতে অনর্থ সৃষ্টি হতে পারে। শুধু গোপন ও প্রকাশ্য মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যথেষ্ট নয়; বরং) শুভ পরিণাম আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য (যারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার সাথে সাথে সৎকর্মও করে থাকে। কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি এ ভাবে হবে যে,) যে (কিয়ামতের দিন) সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার (প্রাপ্যের) চাইতে উত্তম ফল পাবে। (কেননা সৎকর্মের প্রতিদান সমানানুপাতে হওয়া তার আসল চাহিদা; কিন্তু সেখানে বেশি দেওয়া হবে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে দশ গুণ।) এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা মন্দ কর্মের পরিমাণেই প্রতিফল পাবে (অর্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে অধিক শাস্তি বা প্রতিফল দেওয়া হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا——এই আয়াতে পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। علو শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। فساد বলে অপরের ওপর জুলুম বোঝানো হয়েছে।----(সুফিয়ান সওরী)

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, গোনাহ্ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ, গোনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে যারা অহংকার, জুলুম অথবা গোনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই।

জ্ঞাতব্যঃ যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভাল পোশাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমন সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

গোনাহের দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ্ঃ আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোন গোনাহের বদ্ধপরিকরতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ্।---(রূহ) তবে পরে যদি আল্লাহ্র ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গোনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গোনাহ্ করতে সক্ষম না হয়; কিন্তু চেষ্টা যোল আনাই করে, তবে গোনাহ না করলেও তার আমলনামায় গোনাহ্ লেখা হবে।---(গাযযালী)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ——এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্য দুইটি বিষয় জরুরী। এক. ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা এবং দুই. তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা। এই দুইটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যে সব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّي
أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ
تَرْجُوا أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ
إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ
مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

(৮৫) যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বলুন, আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে হিদায়ত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে আছে। (৮৬) আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকর্তার রহমত। অতএব আপনি কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) কাফিররা যেন আপনাকে আল্লাহ্‌র আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর। আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৮৮) আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান তারই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনার শত্রুরা নির্যাতনের মাধ্যমে আপনাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। স্বদেশ থেকে এই জবরদস্তিমূলক উচ্ছেদের কারণে আপনার অন্তরে ব্যথা আছে।

অতএব আপনি সান্ত্বনা লাভ করুন যে,) আল্লাহ্ আপনার প্রতি কোরআন (অর্থাৎ কোরআনের বিধানাবলী পালন ও প্রচার) ফরয করেছেন (যা আপনার নবুয়তের প্রমাণ) তিনি আপনাকে (আপনার) মাতৃভূমিতে (অর্থাৎ মক্কায়) আবার ফিরিয়ে আনবেন। (তখন আপনি স্বাধীন, প্রবল এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন। এমতাবস্থায় বসবাসের জন্য অন্য স্থান মনোনীত করা হলে তা উপকারবশত ও ইচ্ছাকৃত করা হয়, ফলে তা কষ্টের কারণ হয় না। আপনার সত্য নবুয়ত সত্ত্বেও কাফিররা আপনাকে ভ্রান্ত এবং তাদেরকে সত্যপন্থী মনে করে। কাজেই) আপনি (তাদেরকে) বলুন, আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করেছে এবং কে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে (পতিত) আছে। (অর্থাৎ আমি যে সত্যপন্থী এবং তোমরা যে মিথ্যাপন্থী এর অকাট্য প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তোমরা সেগুলোকে যখন কাজে লাগাও না তখন অগত্যা জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। তিনি বলে দেবেন। আপনার এই নবুয়ত নিছক আল্লাহ্র দান। এমন কি, স্বয়ং) আপনি (নবী হওয়ার পূর্বে) আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। কেবল আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটা অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আপনি (তাদের বাজে কথাবার্তায় মনোনিবেশ করবেন না এবং এ পর্যন্ত যেমন তাদের থেকে আলাদা রয়েছেন, ভবিষ্যতেও এমনিভাবে) কাফিরদের মোটেই সমর্থন করবেন না। আল্লাহ্র নির্দেশাবলী আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিররা যেন এগুলো থেকে আপনাকে বিমুখ না করে (যেমন এ পর্যন্ত করতে পারেনি।) আপনি (যথারীতি) আপনার পালনকর্তার (ধর্মের) প্রতি (মানুষকে) দাওয়াত দিন এবং (এ পর্যন্ত যেমন মুশরিকদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ভবিষ্যতেও) কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (এ পর্যন্ত যেমন শিরক থেকে পবিত্র আছেন, এমনিভাবে ভবিষ্যতেও) আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করবেন না। (এসব আয়াতে কাফির ও মুশরিকদেরকে তাদের বাসনা থেকে নিরাশ করা হয়েছে এবং তাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বধর্মে আনয়ন করার যে বাসনা পোষণ কর এবং তাকে অনুরোধ কর, এতে তোমাদের সাফল্যের কোনই সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সাধারণ অভ্যাস এই যে, যার প্রতি বেশি রাগ থাকে, তার সাথে কথা বলা হয় না; বরং প্রিয়জনের সাথে কথা বলে তাকে শোনানো হয়। মা'আলিম গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এসব আয়াতে বাহ্যত রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হলেও উদ্দেশ্য তিনি নন। এ পর্যন্ত রিসালতের বিষয়বস্তু মূল লক্ষ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যদিও প্রসঙ্গক্রমে তওহীদের বিষয়বস্তুও এসে গেছে। অতপর তওহীদের বিষয়বস্তু মূল লক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনি ব্যতীত কেউ উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। (কেননা,) আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। (কাজেই তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এ হচ্ছে তওহীদের বিষয়বস্তু। অতপর কিয়ামতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছে।) রাজত্ব তাঁরই (কিয়ামতে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে।) এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (তখন সবাইকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ —সূরার উপসংহারে এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র বিস্তারিত কাহিনী তথা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা, তাঁর ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাঁকে ফিরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাগে শেষ নবী রসূল (সা)-এর এমনি ধরনের অবস্থার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার কাফিররা তাঁকে বিব্রত করেছে, তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরাপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ —অর্থাৎ যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন তথা তিলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনিই পুনরায় আপনাকে "মা'আদে" ফিরিয়ে নেবেন। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষত হারম ও বায়তুল্লাহ্কে পরিত্যাগ করতে হয়েছে; কিন্তু যিনি কোরআন নাযিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ, শত্রুপক্ষ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহ্ফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হল এবং বায়তুল্লাহ্ ও স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই জিবরাঈল (আ) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় মক্কীও নয়, মদনীও নয়। —(কুরতুবী)

কোরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায়ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী

ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন তিলাওয়াত ও কোরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ—এখানে وَجْهَهٗ বলে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোন কোন তফসীরকার বলেনঃ وَجْهَهٗ বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্য করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহ্র জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে---এছাড়া সব ধ্বংসশীল।

سورة العنكبوت

সূরা আল-'আন কাবুত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝١ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْتَنُوْنَ ۝٢ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝٣ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ
اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۭ سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝٤ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۗءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ
اللّٰهِ لَاٰتٍ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٥ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ
لِنَفْسِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। (৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। (৫) যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (৬) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম---(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কতক মুসলমান যারা কাফিরদের নির্যাতন দেখে ঘাবড়ে যায়। তবে) তারা কি মনে করে যে, তারা 'আমরা বিশ্বাস করি' বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে (নানা বিপদাপদ দ্বারা) পরীক্ষা করা হবে না? (অর্থাৎ এরূপ হবে না; বরং এ ধরনের পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হবে।) আমি তো (এমনি ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা) তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে (মুসলমান) ছিল। (অর্থাৎ অন্যান্য উম্মতের মুসলমানরাও এমনি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। এমনিভাবে তাদেরকেও পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষায়) আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করে দেবেন কারা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী এবং আরও প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী। (সেমতে যারা আন্তরিক বিশ্বাস সহকারে মুসলমান হয়, তারা এসব পরীক্ষায় অবিচল থাকে বরং আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা সাময়িক বিপদ দূরীকরণার্থে মুসলমান হয়, তারা এই কঠিন মুহূর্তে ইসলাম ত্যাগ করে বসে। অর্থাৎ এটা পরীক্ষার একটি রহস্য। কারণ, খাঁটি অখাঁটি মিশ্রিত থেকে যাওয়ার মধ্যে অনেক ক্ষতিকারিতা রয়েছে বিশেষত প্রাথমিক অবস্থায়। মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) যারা মন্দ কাজ করছে, তারা কি মনে করে যে তারা আমার আয়ত্তের বাইরে কোথাও চলে যাবে? তাদের এই সিদ্ধান্ত নেহাতই বাজে। (এটা মধ্যবর্তী বাক্য। এতে কাফিরদের কুপরিণাম শুনিয়ে মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান করা হয়েছে যে, তাদের এই নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। অতপর আবার মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছেঃ) যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ কামনা করে (এসব বিপদাপদ দেখে তার পেরেশান হওয়া উচিত নয়। কেননা) আল্লাহ্র (সাক্ষাতের) সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে, (যার ফলে সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ্ বলেনঃ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (কোন কথা ও কাজ তাঁর কাছ থেকে গোপন নয়। সুতরাং সাক্ষাতের সময় তোমাদের সব উক্তিগত ও কর্মগত ইবাদতের প্রতিদান দিয়ে সব চিন্তা দূর করে দেবেন।) এবং (মনে রেখ, আমি যে তোমাদের কষ্ট স্বীকার করতে উৎসাহিত করছি, এতে আমার কোন লাভ নেই; বরং) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে নিজের (লাভের) জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। (নতুবা) আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ববাসীদের মুখাপেক্ষী নয়। (এতেও কষ্ট স্বীকারের প্রতি উৎসাহ রয়েছে। কেননা নিজের লাভ জানার কারণে তা করা আরও সহজ হয়ে যায়। লাভের বর্ণনা এই যে,) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের গোনাহ্ দূর করে দেব। (কুফর ও শিরক তো ঈমান দ্বারা দূর হয়ে যায়। কতক গোনাহ্ তওবা দ্বারা, কতক গোনাহ্ সৎ কাজ দ্বারা এবং কতক গোনাহ্ বিশেষ অনুগ্রহে মাফ হয়ে যাবে।) এবং তাদেরকে তাদের কর্মের চাইতে উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেব (সুতরাং এত উৎসাহ দানের পর ইবাদত ও সাধনায় দৃঢ় থাকতে যত্নবান হওয়া জরুরী)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يفتنون—ولهم لا يفتنون শব্দটি فتنة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। ঈমানদার বিশেষত পয়গম্বরগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাঁদেরই হাতে এসেছে। এই সব পরীক্ষা কোন সময় কাফির ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে; যেমন অধিকাংশ পয়গম্বর, শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে; যেমন হযরত আইয়ুব (আ)-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেওয়া হয়েছে।

রেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূল সেই সব সাহাবী, যাঁরা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলিম, সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন।—(কুরতুবী)

فليعلمن الله الذين صدقوا—অর্থাৎ এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তা'আলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা আছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (র) থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে, কোরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝

(৮) আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে। (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। (এবং এতদসঙ্গে একথাও বলেছি যে,) যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে তোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই (এবং প্রত্যেক বস্তুই যে ইবাদতের যোগ্য নয়, তার প্রমাণাদি আছে) তবে (এ ব্যাপারে) তাদের আনুগত্য করো না। তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু (সৎ ও অসৎ কর্ম) তোমরা করতে। (তোমাদের মধ্যে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে ও সৎকর্ম করবে আমি তাদেরকে সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে জান্নাতে দেব। এমনিভাবে কুকর্মের কারণে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেব। এর ভিত্তিতেই যারা পিতামাতার আনুগত্যকে আমার আনুগত্যের উপর অগ্রাধিকার দেবে, সে শাস্তি পাবে। যে এর বিপরীত করবে, সে শুভ প্রতিদান পাবে। মোটকথা, নিষিদ্ধ কাজে পিতামাতার অবাধ্যতা করলে গোনাহ্ হবে বলে ধারণা করা উচিত নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ—হিতাকাঙ্ক্ষা ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোন কাজ করতে বলাকে وصيت বলা হয়।—(মাযহারী)

بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا —حسن শব্দটি ধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্য-মণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে حسن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي—অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্ত পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে ঃ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق—অর্থাৎ আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবু সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যু বরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও।—(মুসলিম ও তিরমিযী) এই আয়াত হযরত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সা'দের জননী এক দিন এক রাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহ্র ফরমানের মুকাবিলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন ঃ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন, যান। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অনশন ভঙ্গ করল।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ
النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا

مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ
مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا
مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

(১০) কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্‌র আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম!' বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? (১১) আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফিক। (১২) কাফিররা-মু'মিনদেরকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। অথচ তারা তাদের পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (১৩) তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। অবশ্য তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতপর আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্‌র আযাবের মত (ভয়ংকর) মনে করে। (অথচ মানুষ এরূপ আযাব দেওয়ার শক্তিই রাখে না। এখন তাদের অবস্থা এই যে,) যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে (মুসলমানদের) কোন সাহায্য আসে, (উদাহরণত জিহাদে এরা যখন বন্দী হয়ে আসে,) তখন তারা বলে, আমরা তো (ধর্ম ও বিশ্বাসে) তোমাদের সাথেই ছিলাম। (অর্থাৎ মুসলমানই ছিলাম, যদিও কাফিরদের জোর-জবরদস্তির কারণে তাদের সাথে যোগদান করেছিলাম আল্লাহ বলেন,) আল্লাহ্ কি বিশ্ববাসীর মনের কথা সম্যক অবগত নন? (অর্থাৎ তাদের অন্তরেই ঈমান ছিল না। এসব ঘটনা ঘটার কারণ এই যে,) আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন বিশ্ববাসীদের এবং জেনে নেবেন মুনাফিকদেরও। কাফিররা মুসলমানদের বলে, তোমরা (ধর্মে) আমাদের পথ অনুসরণ কর। (কিয়ামতে) তোমাদের (কুফর ও অবাধ্যতার) পাপভার আমরা বহন করব। (তোমরা মুক্ত থাকবে।) অথচ তারা

তাদের পাপভার কিছুতেই (তোমাদের মুক্ত করে) বহন করতে পারবে না। তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে। (তবে) তারা নিজেদের পাপভার (পুরাপুরি) এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। (তারা যেসব পাপের কারণ হয়েছিল, এগুলো সেই পাপ। তারা এসব পাপভার বহন করার কারণে আসল পাপমুক্ত হয়ে যাবে না। মোটকথা, আসল পাপীরা হালকা হবে না; কিন্তু তারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে তাদের পাপের বোঝা আরও ভারী হয়ে যাবে।) তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করত সে সম্পর্কে তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে (অতঃপর এ কারণে শাস্তি হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا—কাফিরদর পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমনি একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফিররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালের শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে. আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রুকূতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى—এতে উল্লিখিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফির সঙ্গীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কিয়ামতের দিন তোমার আযাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থকড়ি দেওয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফিরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে বলেছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ—অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নজমে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহ্র পক্ষ

থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হবে না। কেননা, একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়নীতির পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে---একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সে-ও পাপী; আসল পাপীর যে শাস্তি হবে তার প্রাপ্যও তা-ই ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবূ হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের সওয়াব দাওয়াত-দাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং সৎকর্মীদের সওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না।---(কুরতুবী)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ
عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝١٤ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَصْحٰبَ
السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝١٥ وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا
اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝١٦ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ
وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١٧ وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ
قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝١٨

(১৪) আমি নূহ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী। (১৫) অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকা-রোহীগণকে রক্ষা করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাম বিশ্ববাসীর জন্য। (১৬) স্মরণ কর ইবরাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন—তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝা। (১৭) তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৮) তোমরা যদি মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছে। স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়াই তো রসূলের দায়িত্ব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নূহ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ-কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছেন (এবং নিজ সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন)। অতঃপর (তারা যখন ঈমান কবুল করল না, তখন) তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছে। তারা ছিল বড় জালিম। (এত দীর্ঘ দিনের উপদেশেও তাদের মন গলল না।) অতঃপর (প্লাবন আসার পর) আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে (যারা তাঁর সাথে আরোহণ করেছিল, এই প্লাবন থেকে তাদের) রক্ষা করলাম এবং এই ঘটনাকে বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষাপ্রদ করলাম। (তারা চিন্তাভাবনা করে বুঝতে পারে যে, বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি কি হয়) এবং আমি ইবরাহীম (আ)-কে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করলাম। যখন তিনি তাঁর (মূর্তিপূজারী) সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর (ভয় করে শিরক ত্যাগ কর)। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ (শিরক নিছক নির্বুদ্ধিতা)। তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে কেবল (অক্ষম ও অকর্মণ্য) প্রতিমার পূজা করছ এবং (এ ব্যাপারে) মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করছ (যে, তাদের দ্বারা আমাদের রুযী রোজগারের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এটা নির্জলা মিথ্যা। কেননা) তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের কোন রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কাছেই রিযিক তালাশ কর। (অর্থাৎ তাঁর কাছে চাও, রিযিকের মালিক তিনিই। তিনিই যখন মালিক, তখন) তাঁরই ইবাদত কর এবং (অতীত রিযিক তিনিই দিয়েছেন, তাই) তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এ হচ্ছে ইবাদত করার এক কারণ; দ্বিতীয় কারণ এই যে, তিনি ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখেন। সেমতে) তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (তখন কুফরের কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন।) যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে (মনে রেখ, এতে আমার কোন ক্ষতি নেই)

তোমাদের পূর্ববর্তীরাও (পয়গম্বরগণকে এভাবে) মিথ্যাবাদী বলেছে (এতে সেই পয়গম্বরগণের কোন ক্ষতি হয়নি।) এবং (এর কারণ এই যে,) (স্পষ্টভাবে) পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়াই রসূলের দায়িত্ব। (মানানো তাঁর কাজ নয়। সুতরাং পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর পয়গম্বরগণ দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন। আমিও তেমনি। সুতরাং আমার কোন ক্ষতি নেই। তবে মেনে নেওয়া তোমাদের প্রতি ওয়াজিব ছিল। এটা তরক করার কারণে তোমাদের ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাফিরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোন সময় সাহস হারান নি। তাই আপনিও কাফিরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গম্বর, যিনি কুফর ও শিরকের মুকাবিলা করেছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন পয়গম্বর ততটুকু হন নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফিরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কোরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয় শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তার আরও বয়স আছে।

মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফিরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো---এগুলো সব নূহ (আ)-এরই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় কাহিনী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ্ করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত লূত (আ) ও তাঁর উম্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা---এগুলো সব রসূলুল্লাহ্ (সা) ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ
اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾
يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنتُم
بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا
مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

(১৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন? এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (২০) বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন' অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন। তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমরা স্থলে ও অন্তরীক্ষে আল্লাহ্কে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (২৩) যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ ও তার সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন (অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন), অতঃপর তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ। (বরং প্রাথমিক দৃষ্টিতে পুনরায় সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার চাইতে অধিকতর সহজ, যদিও আল্লাহ্র সত্তাগত শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে উভয়ই সমান।) তারা প্রথম বিষয় অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা এ বিষয় তো স্বীকার করতো যেমন বলা হয়েছে ঃ ولئن سألتهم من خلق السموات الخ কিন্তু দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ পুনরায় সৃষ্টি করা স্বীকার করত না;

অথচ এটা করা অধিক স্পষ্ট। তাই أَوَلَمْ يَرَوْا -এর সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে অতঃপর এই বিষয়বস্তুই পুনরায় ভিন্ন ভঙ্গিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শোনানো হচ্ছে]ঃ আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। (প্রথম বর্ণনায় একটি যুক্তিগত প্রমাণ আছে এবং দ্বিতীয় বর্ণনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ আছে; অর্থাৎ সৃষ্ট জগৎ প্রত্যক্ষ করা। এ পর্যন্ত কিয়ামত সপ্রমাণ করা হল। অতঃপর প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছে যে, পুনরুত্থানের পর) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন (অর্থাৎ যে এর যোগ্য হবে) এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করবেন। (অর্থাৎ যে এর হকদার হবে। এতে কারও কোন দখল থাকবে না। কেননা) তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (অন্য কারও দিকে নয়। তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।) তোমরা স্থলে (আত্মগোপন করে) ও অন্তরীক্ষে (উড়ে) আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না (যে, তিনি তোমাদেরকে ধরতে পারবেন না।) আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই; কোন সাহায্যকারীও (সুতরাং নিজ চেষ্টায়ও বাঁচতে পারবে না এবং অন্যের সাহায্যেও বাঁচতে পারবে না। ওপরে যে আমি বলেছিলাম يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ —এখন সামগ্রিক নীতির মাধ্যমে এরা কারা---বর্ণনা করছি) যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও তার সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তারা (কিয়ামতে) আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে। (অর্থাৎ তখন তারা প্রত্যক্ষ করবে যে, তারা রহমতের পাত্র নয়।) এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ
مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ وَّمَاْوٰىكُمُ
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ
اِلٰى رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَ

يَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي
الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝

(২৪) তখন ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এ ছাড়া কোন জওয়াব ছিল না যে, তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) ইবরাহীম বললেন, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৬) অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লূত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (২৭) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তার বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাকে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয় পরকালেও সে সৎলোকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইবরাহীমের এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর) তার সম্প্রদায়ের (চূড়ান্ত) জওয়াব এটাই ছিল যে, তারা (পরস্পরে) বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। (সেমতে অগ্নিদগ্ধ করার ব্যবস্থা করা হল।) অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন (সূরা আম্বিয়ায় এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে)। নিশ্চয়ই এই ঘটনায় ঈমান-দার সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। [অর্থাৎ এই ঘটনা কয়েকটি বিষয়ের প্রমাণ ও আল্লাহ্র সর্বশক্তিমান হওয়া, ইবরাহীম (আ)-এর পয়গাম্বর হওয়া, কুফর ও শিরকের অসারতা ইত্যাদি। তাই এই এক প্রমাণই কয়েকটি প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে।] ইবরাহীম [(আ) ওয়াযে আরও] বললেন, পার্থিব জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। (সেমতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ স্বজন, বন্ধু ও আত্মীয়দের অনুসৃত পথে থাকে এবং এ কারণে সত্য-মিথ্যা চিন্তা করে না। সত্যকে সত্য জেনেও ভয় করে যে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে যাবে।) এরপর কিয়ামতের দিন (তোমা-দের এই অবস্থা হবে যে,) তোমরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত করবে। (যেমন সূরা আ'রাফে আছে ঃ لَعَنَتْ أُخْتَهَا সূরা সাবায় আছে ঃ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا—সূরা বাকারায় আছে ঃ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ

اَلَّذِيْنَ اتَّبَعْتُمْ---সারকথা এই যে, আজ যেসব বন্ধু ও আত্মীয়ের কারণে তোমরা পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করেছ, কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে।) এবং (তোমরা এই প্রতিমাপূজা থেকে বিরত না হলে) তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না। (এতে উপদেশের পরও তার সম্প্রদায় বিরত হল না।) শুধু লূত (আ) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, আমি (তোমাদের মধ্যে থাকব না। বরং) আমার প্রতিপালকের (নির্দেশিত স্থানের) উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তিনি আমার হিফাযত করবেন এবং আমাকে এর ফল দেবেন।) আমি (হিজরতের পর) তাঁকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রাখলাম এবং তাঁর প্রতিদান তাঁকে দুনিয়াতেও দিলাম এবং পরকালেও তিনি (উচ্চস্তরের) সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (এই প্রতিদান বলে নৈকট্য ও কবুল বোঝানো হয়েছে; যেমন, সূরা বাকারায় রয়েছে ঃ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي---হযরত লূত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাগ্নেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহীম (আ)-এর মু'জিযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং তাঁর পত্নী সারা, যিনি চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গী হন। কূফার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي---অর্থাৎ আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার ইবাদতে কোন বাধা নেই।

হযরত নখয়ী ও কাতাদাহ বলেন, إِنِّي مُهَاجِرٌ হযরত ইবরাহীমের উক্তি। কেননা এর পরবর্তী বাক্য وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ তো নিশ্চিতরূপে তাঁরই অবস্থা। কোন কোন তফসীরকার إِنِّي مُهَاجِرٌ--কে হযরত লূত (আ)-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। হযরত

লূত (আ)-ও এই হিজরতে শরীক ছিলেন; কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লূত (আ)-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম পয়গম্বর, যাঁকে দীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন।---(কুরতুবী)

কোন কোন কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায় ঃ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا---অর্থাৎ আমি ইবরাহীম (আ)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদী, খৃস্টান, প্রতিমা পূজারী সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিগকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে; কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেওয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎ কর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا
مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ
السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ۭ فَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝
قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَلَمَّا جَاۗءَتْ
رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ
اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۭ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ
بِمَنْ فِيْهَا ۡ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۡ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝
وَلَمَّآ اَنْ جَاۗءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْۗءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا

لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

(২৮) আর প্রেরণ করেছি লূতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। (২৯) তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ? জওয়াবে তার সম্প্রদায় কেবল এ কথা বলল, আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালিম। (৩২) সে বলল, এই জনপদে তো লূতও রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তার স্ত্রী ব্যতীত; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৩) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা আপনাকেও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৪) আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের ওপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (৩৫) আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি লূত (আ)-কে পয়গাম্বর মনোনীত করে প্রেরণ করেছি। যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ। (এটাই অশ্লীল কাজ। এ ছাড়া অন্যান্য অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডও করছ; যেমন) তোমরা রাহাজানি করছ (সর্বনাশের কথা এই যে,) নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ। (গোনাহ্ প্রকাশ করা স্বয়ং একটি গোনাহ্।) তাঁর সম্প্রদায়ের (চূড়ান্ত) জওয়াব এটাই ছিল যে, আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও (যে, এসব কাজ আযাবের কারণ।) লূত (আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে জয়ী

(এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস) কর। [তাঁর দোয়া কবুল হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা আযাবের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করলেন। এই ফেরেশতাদের যিম্মায় এই কাজও দেওয়া হল যে, ইবরাহীম (আ)-কে ইসহাক পয়দা হওয়ার সংবাদ দাও। সে-মতে] যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন (কথাবার্তার মাঝখানে) তারা [ইবরাহীম (আ)-কে] বলল, আমরা (লূত-সম্প্রদায়ের) এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। (কেননা) এর অধিবাসীরা বড় জালিম। ইবরাহীম (আ) বললেন, সেখানে তো লূতও রয়েছে। (কাজেই সেখানে আযাব এলে সে-ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।) ফেরেশতারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে (অর্থাৎ মু'মিন-গণসহ) রক্ষা করব (আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে জনপদের বাইরে নিয়ে যাব।) তাঁর স্ত্রী ব্যতীত; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। [সূরা হুদ ও সূরা হিজরে এর আলোচনা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে কথাবার্তা শেষ করে] যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন লূত (আ) তাদের (আগমনের) কারণে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। [কারণ, তারা ছিল অত্যন্ত সুশ্রী যুবকের আকৃতিবিশিষ্ট। লূত (আ) তাদেরকে মানুষ মনে করলেন এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের অপকর্মের কথা স্মরণ করলেন। এ কারণে তাদের আগমনে] তাঁর মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। ফেরেশতারা (এ অবস্থা দেখে) বলল, আপনি ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। (আমরা মানুষ নই; বরং আযাবের ফেরেশতা। এই আযাব থেকে) আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (আপনাদেরকে রক্ষা করে) আমরা এই জনপদের (অবশিষ্ট) অধিবাসীদের ওপর একটি নৈসর্গিক আযাব নাযিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (সেমতে সেই জনপদ উল্টে দেওয়া হল এবং প্রস্তর বর্ষণ করা হল)। আমি এই জনপদের কিছু স্পষ্ট নিদর্শন বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের (শিক্ষার) জন্য (এখন পর্যন্ত) রেখে দিয়েছি (মক্কাবাসীরা শাম সফরে এসব জনশূন্য স্থান দেখত এবং বুদ্ধিমানরা ভীত হয়ে ঈমানও কবুল করত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ—এখানে লূত (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম, পুংমৈথুন, দ্বিতীয়, রাহাজানি এবং তৃতীয়, মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কোর-আন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গোনাহ্ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ। কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গোনাহ্ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের

প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেওয়া। উম্মে হানী (রা)-র এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত। (নাউযুবিল্লাহ্)

আয়াতে উল্লিখিত প্রথম গোনাহ্‌টিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে ব্যভিচারের চাইতেও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا
الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ
مِنْ مَسَاكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَ
هَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي
الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ
خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا

إِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

(৩৬) আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (৩৭) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৩৮) আমি আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়িঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুঁশিয়ার। (৩৯) আমি কারূন, ফিরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল। অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু তারা জিতে যায়নি। (৪০) আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাতে, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। (৪১) যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত! (৪২) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪৩) এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই; কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে। (৪৪) আল্লাহ্ যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মাদইয়ানবাসীর প্রতি তাদের (জ্ঞাতি) ভাই শোআয়ব (আ)-কে রসূল করে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। (শিরক ত্যাগ কর।) কিয়ামত দিবসকে ভয় কর (তাকে অস্বীকার করো না।) এবং দেশে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক নষ্ট করো না। তারা কুফর ও শিরকের গোনাহের সাথে মাপে ও ওজনে কম দেয়ার দোষেও দোষী ছিল। ফলে অনর্থ সৃষ্টি হত) কিন্তু তারা শোআয়ব (আ))-কে মিথ্যাবাদী বলে দিল। অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। আ'দ ও সামূদকেও (তাদের হঠকারিতা ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে) ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়িঘর থেকেই তাদের ধ্বংসাবস্থা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। (তাদের

জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ তোমাদের শাম দেশে যাওয়ার পথে পড়ে। তাদের অবস্থা ছিল এই যে,) শয়তান তাদের (কু) কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল (এমনিতে) হুঁশিয়ার (উন্মাদ ও নির্বোধ ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগায়নি।) আমি কারূন, ফিরাউন ও হামানকেও (তাদের কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছি। মূসা (আ) তাদের (তিনজনের) কাছে (সত্যের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু (আমার আযাব থেকে) পালাতে পারেনি। আমি এই পঞ্চ-সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই তার গোনাহের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া (অথাৎ আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি), কাউকে আঘাত করেছে ভীষণ বজ্রনাদ (অর্থাৎ সামূদ সম্প্রদায়কে), কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে (অর্থাৎ কারূনকে) এবং কাউকে করেছি (পানিতে) নিমজ্জিত। (অর্থাৎ ফিরাউন ও হামানকে) এবং (তাদের আযাবের ব্যাপারে) আল্লাহ্ জুলুম করেন নাই। (অর্থাৎ বিনা কারণে শাস্তি দেয়া বাহ্যত জুলুম যদিও সার্বভৌম অধিকারের কারণে আল্লাহ্‌র জন্য এটাও জুলুম ছিল না।) কিন্তু তারা নিজেরাই (দুষ্টামি করে) নিজেদের প্রতি জুলুম করত (যে নিজেদেরকে আযাবের যোগ্য করে ধ্বংস হয়েছে। ফলে, তারাই তাদের ক্ষতি করেছে।) যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতর (সুতরাং মাকড়সা যেমন নিজ ধারণায় তার একটি আশ্রয়স্থল তৈরি করে; কিন্তু বাস্তবে তা দুর্বলতর হওয়ার কারণে না থাকার শামিল হয়ে থাকে, তেমনি মুশরিকরা মিথ্যা উপাস্যদেরকে তাদের আশ্রয় মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তারা আশ্রয় মোটেই নয়।) যদি তারা (প্রকৃত অবস্থা) জানত (তবে এরূপ করত না), তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুর পূজা করে, আল্লাহ্ তা (অর্থাৎ তার স্বরূপ ও দুর্বলতা) জানেন। (সেগুলো খুবই দুর্বল) তিনি (নিজে অর্থাৎ আল্লাহ্) শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (অর্থাৎ তিনি জ্ঞান ও কর্ম শক্তিতে কামিল) এবং (আমি এসব কিছুর স্বরূপ জানি বিধায়) আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্য দেই (তন্মধ্যে একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হয়েছে) এসব উদাহরণের কারণে তাদের মূর্খতা দূর হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেবল জ্ঞানীরাই এগুলো বোঝে (কার্যত জ্ঞানী হোক কিংবা জ্ঞান ও সত্যান্বেষণকারী হোক। এরা জ্ঞানীও নয়, অন্বেষণকারীও নয়। ফলে মূর্খতায় লিপ্ত থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সত্য সত্যই থাকবে। আল্লাহ্ তা জানেন ও বর্ণনা করেন। এ পর্যন্ত প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। এরপর আল্লাহ্ ইবাদতের যোগ্য----এ বিষয়ের প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে) আল্লাহ্ তা'আলা যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (তারাও একথা স্বীকার করে।) ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য এতে (তাঁর ইবাদতের যোগ্যতার) যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব পয়গম্বর ও তাঁদের সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁদের কাহিনী পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিশদভাবে উল্লেখিত হয়েছে। উদাহরণত শোআয়ব (আ)-এর কাহিনী সূরা আ'রাফে ও হূদে। আ'দ ও সামূদের কাহিনীও সূরা আ'রাফে ও হূদে এবং কারূন, ফিরাউন ও হামানের কাহিনী সূরা কাসাসে এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে।

وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ — اِسْتِبْصَار থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চক্ষুষ্মানতা। مُسْتَبْصِر--এর অর্থ চক্ষুষ্মান। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শিরক করে করে আযাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুঁশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকি বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বোঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শাস্তির কোন দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালিম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফিরা করে এবং মজলুম ও বিপদগস্ত কোনঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কিয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো।

সূরা রুমেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হবে। আয়াত ঃ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ—অর্থাৎ তারা জাগতিক কাজ-কর্ম খুব বোঝে ; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন।

কোন কোন তফসীরবিদ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাকে সত্য মনে করত কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ—মাকড়সাকে عَنْكَبُوْت বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোন কোন মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে। বাহ্যত এখানে তা বোঝানো হয়নি। এখানে সে মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরি করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলা বাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য

আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের ওপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

মাস'আলা ঃ মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিষ্কার করা সম্পর্কে আলিমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা, এই ক্ষুদ্র জন্তুটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব হযরত আলী (রা) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও ইবনে আতিয়্যা হযরত আলী থেকেই বর্ণনা করেন যে طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فان تركه يورث الفقر — অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙিনা পরিষ্কার রাখ।---(রূহুল-মা'আনী)

تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ —

মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এ সব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলিমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তাভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে ফোটে না।

আল্লাহ্‌র কাছে আলিম কে? ঃ ইমাম বগভী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, সেই আলিম, যে আল্লাহ্‌র কালাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আল্লাহ্‌র কাছে আলিম হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মসনদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলিম বলেছেন, যারা আল্লাহ্ ও রসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝে।

হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ--(ইবনে কাসীর)

اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

(৪৫) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ (সা) যেহেতু আপনি রসূল, তাই) আপনি (প্রচারের জন্য) আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব (মানুষের সামনে) পাঠ করুন। (উক্তিগত প্রচারের সাথে কর্মগত প্রচারও করুন অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমেও ধর্মের কাজ বলে দিন; বিশেষত) নামায কায়েম করুন। (কেননা, নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতও এবং এর প্রতিক্রিয়াও সুদূরপ্রসারী।) নিশ্চয় নামায (গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে) অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। (অর্থাৎ নামায যেন একথা বলে, তুমি যে মাবূদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করছ এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছ, অশ্লীল ও গহিত কাজে লিপ্ত হওয়া তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা। এমনিভাবে নামায ছাড়া আরও যত সৎকর্ম আছে, সেগুলোও পালনীয়। কারণ, সেগুলো মৌখিক অথবা কার্যত আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণই।) আর আল্লাহ্র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। (তুমি যদি আল্লাহ্র স্মরণে শৈথিল্য প্রদর্শন কর, তবে শুনে নাও,) আল্লাহ্ তোমাদের সব কর্ম জানেন (যেমন কাজ করবে, তেমনি ফল পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ধত কাফির এবং তাদের ওপর বিভিন্ন আযাবের বর্ণনা ছিল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনদের জন্য সান্ত্বনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং

এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না।

মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং এই পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থা-পত্রের দু'টি অংশ আছে, কোরআন তিলাওয়াত করা ও নামায কায়েম করা। উম্মতকে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্য উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমত রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তন্মধ্যে কোরআন তিলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর নামাযকে অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, নামায স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, নামায তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত فحشاء শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে منكر এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তবিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকাহ্-বিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোন এক দিককে منكر বলা যায় না। منكر ও فحشاء শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ্ দাখিল হয়ে গেছে, যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা।

নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ ঃ একাধিক নির্ভর-যোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাযের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে সে গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকে; তবে শর্ত এই যে, শুধু নামায পড়লে চলবে না; বরং কোরআনের ভাষা অনুযায়ী اقامت صلوة হতে হবে। اقامت –এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোন একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই اقامت صلوة –এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামায আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেইভাবে নামায আদায় করা অর্থাৎ

শরীর, পরিধানবস্ত্র ও নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জামা'আতে নামায পড়া এবং নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নত, অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি। অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহ্‌র সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামায কায়েম করে, সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তওফীক-প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামায পড়া সত্ত্বেও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাযের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান। ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ---এই আয়াতের অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ من لم ينهه صلوته عن الفحشاء والمنكر فلا صلوة له অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তার নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামায কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا صلوة لمن لم يطع الصلوة অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করে না, তার নামায কিছুই নয়। বলা বাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের আনুগত্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যার নামায তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামায তাকে আল্লাহ্ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

ইবনে কাসীর উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি নয়; বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে তাঁরা এসব উক্তি করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সত্বরই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।---(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাযের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গোনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি?

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুকু জানা যায় যে, নামায নামাযীকে গোনাহ্ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোন কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরী নয়। কোরআন হাদীসও তো সব মানুষকে গোনাহ্ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই গোনাহ্ করতে থাকে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, নামাযের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাযের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়াও নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে, সে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তওফীকপ্রাপ্ত হয়। যার এরূপ তওফীক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাযে কোন ত্রুটি রয়েছে এবং সে নামায কায়েম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে 'আল্লাহ্‌র স্মরণ'—এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাযে অথবা নামাযের বাইরে আল্লাহ্‌কে যে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশে স্মরণ করেন। (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) আল্লাহ্‌র এই স্মরণ ইবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত।

এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামায পড়ার মধ্যে গোনাহ্ থেকে মুক্তির আসল কারণ হল আল্লাহ্ স্বয়ং নামাযীর দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গোনাহ্ থেকে মুক্তি পায়।

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلٰهُنَا وَإِلٰهُكُمْ
وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۚ فَالَّذِينَ
آتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هٰؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ

بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ
بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْعِلْمَ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ
عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ
مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ
شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا
بِاللّٰهِ ۙ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۭ وَلَوْلَآ
اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاۗءَهُمُ الْعَذَابُ ۭ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾
يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۭ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

(৪৬) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না; কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তারই আজ্ঞাবহ। (৪৭) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফিররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৪৮) আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেন নি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেন নি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত। (৪৯) বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা (কোরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার

আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৫০) তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বলুন নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (৫১) এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ আছে। (৫২) বলুন—আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৫৩) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে না। (৫৪) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে; অথচ জাহান্নাম কাফিরদেরকে ঘেরাও করছে। (৫৫) যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে। আল্লাহ্‌ বলবেন তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[যখন পয়গম্বর (সা)-এর রিসালত প্রমাণিত, তখন হে মুসলমানগণ, রিসালত অস্বীকারকারীদের মধ্যে যারা কিতাবধারী, তাদের সাথে কথাবার্তার পদ্ধতি আমি বলে দিচ্ছি। বিশেষ করে কিতাবধারীগণের কথা বলার কারণ এই যে, প্রথমত তারা বিদ্বান হওয়ার কারণে কথা শোনে। পক্ষান্তরে মুশরিকরা কথা শোনার আগেই নির্যাতন শুরু করে দেয়। দ্বিতীয়ত বিদ্বানগণ ঈমান আনলে সর্বসাধারণের ঈমান অধিক প্রত্যাশিত হয়ে যায়। পদ্ধতিটি এই ঃ] তোমরা কিতাবধারীগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না; কিন্তু উত্তম পন্থায়। তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী। (তাদেরকে কটু ভাষায় জওয়াব দেওয়ায় দোষ নেই; যদিও এ ক্ষেত্রেও উত্তম পন্থায় জওয়াব দেওয়া ভাল।) এবং (উত্তম পন্থা এই যে, উদাহরণত তাদেরকে) বল, আমরা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সেই কিতাবেও (বিশ্বাস স্থাপন করেছি), যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (কেননা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়াই বিশ্বাস স্থাপনের ভিত্তি। আমাদের কিতাব যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, একথা যখন তোমাদের কিতাব দ্বারাও প্রমাণিত, তখন আমাদের কিতাব কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের উচিত। তোমরাও স্বীকার কর যে,) আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই; (যেমন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا الخ তওহীদ যখন সর্বসম্মত বিষয় এবং পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের প্রতি আনুগত্যের কারণে শেষ নবী (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা তওহীদের পরিপন্থী, তখন আমাদের নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের উচিত। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا الخ

—এই কথাবার্তার পর তোমরা যে মুসলমান, একথা হুশিয়ারীর উদ্দেশ্যে শুনিয়ে দাও) আমরা তো তাঁরই আনুগত্য করি, (এতে বিশ্বাস ও কর্ম প্রভৃতি সব এসে গেছে। অর্থাৎ তোমাদেরও এরূপ করা উচিত। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ—আমি পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি যেমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি (যার ভিত্তিতে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্কের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে) অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব (অর্থাৎ কিতাবের হিতকর জ্ঞান) দিয়েছি, তারা এই কিতাবে বিশ্বাস করে এবং তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কও কুত্রাপি হয়ে থাকে) এবং এদেরও (মুশরিকদেরও) কেউ কেউ এমন (ন্যায়পন্থী) যে, তারা এতে বিশ্বাস রাখে (বুঝে হোক কিংবা বিদ্বানদের ঈমান দেখে হোক। প্রমাণাদি পরিস্ফুট হওয়ার পর) কেবল (হঠকারী) কাফিররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (উপরে বিশেষভাবে ইতিহাসবিদগণকে সম্বোধন করে ইতিহাসগত প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ব্যাপক সম্বোধনের মাধ্যমে যুক্তিগত প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, তাদের কাছে সন্দেহের কোন উৎসও তো নেই। কেননা) আপনি তো এই কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেন নি এবং নিজ হাতে কোন কিতাব লেখেনি নি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত (যে, সে লেখাপড়া জানা মানুষ। খোদায়ী গ্রন্থসমূহ দেখে-শুনে সেগুলোর সাহায্যে অবসর সময়ে বিষয়বস্তু চিন্তা করে নিজে লিখে নিয়েছে এবং মুখস্থ করে আমাদের শুনিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ এরূপ হলে সন্দেহের কিছুটা উৎস হত; যদিও তখনও সন্দেহকারীরা মিথ্যাবাদীই হত; কেননা কোরআনের অলৌকিকতা এরপরও নবুয়তের যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু এখন তো সন্দেহের এরূপ কোন উৎসও নেই। কাজেই এই কিতাব সন্দেহের পাত্র নয়।) বরং এই কিতাব (এক হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এর প্রতিটি অংশই মু'জিযা এবং অংশও অনেক, তাই সে একাকীই যেন) যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে অনেক সুস্পষ্ট প্রমাণ। (অলৌকিকতা দেদীপ্যমান হওয়া সত্ত্বেও) কেবল হঠকারীরাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (নতুবা ন্যায়পন্থীদের মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।) তারা (কোরআনরূপী মু'জিযা দেওয়া সত্ত্বেও নিছক হঠকারিতাবশত) বলে, তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি (আমাদের চাওয়া) নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হল না কেন? আপনি বলুন, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন (আমার ক্ষমতাধীন বিষয় নয়)। আমি তো (আল্লাহর আযাব থেকে) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী (রসূল) মাত্র। (রসূল হওয়ার বিশুদ্ধ প্রমাণ আমার আছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রমাণ হচ্ছে কোরআন। এরপর আর কোন বিশেষ প্রমাণের কি প্রয়োজন? বিশেষত যখন সেই প্রমাণ না আসার মধ্যে রহস্যও রয়েছে। অতঃপর কোরআন যে বড় প্রমাণ, তা বর্ণিত হচ্ছে।) এটা কি (নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে) তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব (মু'জিযা) নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে (সর্বদা) পাঠ করা হয়, (যাতে একবার শুনলে অলৌকিকতা প্রকাশ না পায়, তবে দ্বিতীয়বার শুনলে প্রকাশ

পায় অথবা এর পরে প্রকাশ পায়। অন্য মু'জিযায় তো এ বিষয়ও থাকত না। কেননা তা চিরস্থায়ী অলৌকিক হত না। এই মু'জিযায় আরও একটি অগ্রাধিকার এই যে,) নিশ্চয়ই এই কিতাবে (মু'জিযা হওয়ার সাথে) বিশ্বাসী লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ আছে। (রহমত এই যে. এই কিতাব খাঁটি উপকারী বিধানাবলী শিক্ষা দেয় এবং উপদেশ এই যে, উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে। অন্য মু'জিযার মধ্যে এই গুণ কোথায় থাকত? এসব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একে মহা সুযোগ মনে করে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। এসব প্রমাণের পরেও যদি তারা বিশ্বাস না করে, তবে শেষ জওয়াব হিসাবে) আপনি বলে দিন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই (আমার রিসালতের) যথেষ্ট সাক্ষী। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে। (যখন আমার রিসালত ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের পরিব্যাপ্তি প্রমাণিত হল, তখন) যারা মিথ্যায় বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কথাকে) অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র কথা দ্বারা আমার রিসালত প্রমাণিত তখন একে অস্বীকার করা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা। আল্লাহ্‌র জ্ঞান সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত, তিনি এই অস্বীকৃতির কথাও জানেন। তিনি এর জন্য শাস্তি দেন। সুতরাং তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে (এবং তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে আপনার রিসালতে সন্দেহ করে।) যদি (আল্লাহ্‌র জ্ঞানে আযাব আসার জন্য) সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে (তাদের চাওয়ার সাথে সাথেই আযাব তাদের ওপর এসে যেত। (যখন সেই সময় এসে যাবে,) আকস্মিকভাবে তাদের উপর এ আযাব এসে যাবে অথচ খবরও থাকবে না। (অতঃপর তাদের মূর্খতা প্রকাশ করার জন্য তাদের আযাব ত্বরান্বিত করার কথা পুনরায় উল্লেখ করে আযাবের নির্দিষ্ট সময় ও আযাবের কথা বলা হচ্ছে ঃ) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে (আযাবের প্রকার এই যে,) নিচয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে (চার দিক থেকে) ঘিরে নেবে। যেদিন আযাব তাদেরকে উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে ঘেরাও করবে এবং (আল্লাহ্‌ তখন তাদেরকে) বলবেন, তোমরা (দুনিয়াতে) যা কিছু করতে, (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণত কঠোর কথা-বার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসুলভ হট্টগোলের জওয়াব গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا—কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি জুলুম করে—তোমাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মুকাবিলায় জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেওয়া

জায়েয; যদিও তখনও তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং জুলুমের জওয়াবে জুলুম না করাই শ্রেয়; যেমন কোরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে; কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা নহলে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য, যাতে বলা হয়েছে—আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোন অন্তরায় থাকা উচিত নয়। ইরশাদ হয়েছে—قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ—অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্য তোমরা এ কথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গাম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গাম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই।

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইনজীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি ?ঃ এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইন্‌জীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সব কিতাবে যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বর্তমান তওরাত ও ইন্‌জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলেও এই সব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে. মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বস্তু প্রতি, যেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তওরাত ও ইনজীলকে সত্যও বলতে নেই এবং মিথ্যাও বলতে নেই ঃ সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন কিতাবধারীরা তাদের তওরাত ও ইন্‌জীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবী অনুবাদ শোনাত। রসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাব-ধারীদেরকে সত্যবাদীও বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং এ কথা বল ঃ

اٰمَنَّا بِالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَاُنْزِلَ اِلَیْكُمْ—অর্থাৎ আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তফসীরগ্রন্থসমূহে তফসীরকারকগণ কিতাবধারীদের যে-সব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। কোন কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِیَمِیْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ আপনি কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোন কিতাব লিখতেও পারতেন না: বরং আপনি ছিলেন **উম্মী**। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্য অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তওরাত ও ইন্‌জীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কোরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোন নতুন বিষয়-বস্তু নয়।

নিরক্ষর হওয়া রসূলুল্লাহ (সা)-র একটি বড় শ্রেষ্ঠত্ব ও বড় মু'জিযা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য যেসব সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোন কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোন সময় কিতাবধারীদের সাথেও মেলামেশা করেন নি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। কারণ, মক্কায় কোন কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে, যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে যেমন ছিল মু'জিযা, তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোন কোন আলিম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথম দিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসাবে তারা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা আপনাকে রসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের সাথে 'রসূলুল্লাহ্' শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাজা (রা)। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ লিখে দিলেন।

এই রেওয়ায়েতে 'রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে লিখে দিয়েছেন' বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বুঝে নিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও "সে লিখেছে" বলা হয়ে থাকে। এ ছড়া এটাও সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মু'জিযা হিসাবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এতদ্ব্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষরতার সীমা পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) লেখা জানতেন---বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তাঁর কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۚ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۭ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾
وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَاۗبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۡ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾ وَلَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۭ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۭ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

(৫৬) হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর। (৫৭) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের! (৫৯) যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার ওপর ভরসা করে। (৬০) এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহ্‌ই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্‌'। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (৬২) আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্‌'। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, (যখন তারা চূড়ান্ত শত্রুতাবশত শরীয়ত ও ধর্মাবলম্বনের কারণে তোমাদের ওপর নিপীড়ন চালায়, তখন এখানে থাকাই কি জরুরী?) আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব (যদি এখানে থেকে ইবাদত করতে না পার, তবে অন্য কোথাও চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে) একান্তভাবে আমারই ইবাদত কর (কেননা এখানে মুশরিকদের জোর বেশি। সুতরাং খাঁটি তওহীদ ভিত্তিক ও শিরকমুক্ত ইবাদত এখানে সুকঠিন। তবে শিরকযুক্ত ইবাদত এখানে সম্ভবপর; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ইবাদতই নয়। যদি দেশত্যাগে আত্মীয়স্বজন ও মাতৃভূমির বিচ্ছেদ তোমাদের কাছে কঠিন মনে হয়, তবে বুঝে নাও যে, একদিন না একদিন এই বিচ্ছেদ হবেই। কেননা) জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ (অবশ্যই) গ্রহণ করবে। (তখন সবাই ছেড়ে যাবে।) অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (অবাধ্য হয়ে আমার মধ্যে শাস্তির ভীতি পুরোপুরিই বিদ্যমান।) আর (যদি এই বিচ্ছেদ আমার সন্তুষ্টির কারণে হয়, তবে আমার কাছে পৌঁছার পর এই ওয়াদার যোগ্য পাত্র হয়ে যাও যে, যারা

বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে (যেসব সৎকর্ম সম্পন্ন করা মাঝে মাঝে দেশ-ত্যাগের ওপর নির্ভরশীল থাকে, ফলে তখন তারা দেশত্যাগও করে,) আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। (সৎ) কর্মীদের কত চমৎকার পুরস্কার! যারা (হিজরতের বিপদসহ নানা বিপদাপদে) সবর করে এবং (অন্য দেশে পৌঁছার পর কষ্ট ও রুযী-রোজগারের যে সমস্যা দেখা দেয়, তাতে) তাদের পালনকর্তার ওপর নির্ভর করে। (যদি হিজরতের ব্যাপারে তোমাদের মনে কুমন্ত্রণা দেখা দেয় যে, বিদেশে খাদ্য কোথায় পাওয়া যাবে, তবে জেনে রাখ;) এমন অনেক জীবজন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। (অনেক জীবজন্তু আবার রাখেও।) আল্লাহ্ই তাদেরকে (নির্ধারিত) রুযী পৌঁছান এবং তোমাদেরকেও (তোমরা যেখানেই থাক না কেন। কাজেই এরূপ কুমন্ত্রণাকে মনে স্থান দিও না; বরং মন শক্ত করে আল্লাহ্র ওপর নির্ভর কর।) আর (তিনি ভরসার যোগ্য। কেননা) তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। এমনিভাবে অন্যান্য গুণেও তিনি পূর্ণতার অধিকারী। যিনি এমন পূর্ণ গুণসম্পন্ন, তিনি অবশ্যই ভরসার যোগ্য। ইবাদতগত তওহীদ সৃষ্টিগত তওহীদের ওপর ভিত্তিশীল। সৃষ্টিগত তওহীদ তাদের কাছেও স্বীকৃত। সেমতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্'। তাহলে (সৃষ্টিগত তওহীদ যখন স্বীকার করে, তখন ইবাদতগত তওহীদের বেলায়) তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (স্রষ্টা যেমন আল্লাহ্-ই, তেমনি) আল্লাহ্-ই (রিযিকদাতাও; সেমতে তিনি) তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা, হ্রাস করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (যেরূপ উপযোগিতা দেখেন, সেইরূপ রিযিক দেন। মোটকথা, তিনিই রিযিকদাতা। কাজেই রিযিকের আশংকা হিজরতের পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র তওহীদ তাদের কাছেও স্বীকৃত। এমনিভাবে জগতকে স্থায়ী রাখা ও তার পরিচালনার ক্ষেত্রেও তারা তওহীদ স্বীকার করে। সেমতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মাটিকে শুষ্ক (ও অনুর্বর) হওয়ার পর সঞ্জীবিত (ও উর্বর) করে, তবে তারা (জওয়াবে) অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। বলুন, আলহামদুলিল্লাহ্ (এতটুকু তো স্বীকার করলে, যদ্দ্বারা ইবাদতগত তওহীদও পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু তারা মানে না;) বরং (তদুপরি) তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না। (জ্ঞান নেই, এ কারণে নয়, বরং তারা জ্ঞানকে কাজে লাগায় না এবং চিন্তা-ভাবনাও করে না ফলে জাজ্বল্যমান বিষয়ও তাদের অবোধগম্য থেকে যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফিরদের শত্রুতা, তওহীদ ও রিসালত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থীদের পথে নানা রকম বাধা-বিঘ্ন বর্ণিত

হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্য কাফিরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন ঃ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ——আল্লাহ্ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারও এই ওযর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফিররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তওহীদ ও ইবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্‌র জন্য সেই দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একেই হিজরত বলা হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবত দুই প্রকার আশংকা ও বাধার সম্মুখীন হয়। এক. নিজের প্রাণের আশংকা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফিররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্ধত হবে। এ ছাড়া অন্য কাফিরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এই আশঙ্কার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ---অর্থাৎ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মু'মিনের কাজ হতে পারে না। হিফাযতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষত আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নিয়ামতের কারণ। পরকালে এই সুখ ও নিয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে ঃ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا الخ

হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুযী-রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবন নির্বাহ কিরূপে হবে? পরের আয়াতত্রয়ে

এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিযিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই রিযিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিযিক দান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে ঃ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ অর্থাৎ চিন্তা কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীবজন্তু আছে, যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ জীবজন্তু এরূপই। কেবল পিপীলিকা ও ইঁদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই গ্রীষ্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে; কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে যায়। মোট কথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা অন্য খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্য তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পশুপক্ষী সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেতখোলা, না আছে জমি ও বিষয়সম্পত্তি। তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্ তা'আলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেট-চুক্তি খাদ্য লাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়---বরং তাদের আজীবনের কর্মধারা।

রিযিকের আসল উপায় আল্লাহ্র দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, স্বয়ং কাফিরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? চন্দ্র সূর্য কার আজ্ঞাধীন পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে? বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে? এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহ্রই কাজ। আপনি বলুন, তা হলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের পূজাপাট ও অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর?

মোট কথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও মানুষের ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজসরঞ্জামের আয়ত্তাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর দান। তিনিই এ দেশে এর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজসরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয়? হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসা-র ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সূরারই ৮৯ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে বর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ওপর "ফরযে আইন" ছিল। অবশ্যি যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

সে যুগে হিজরত শুধু ফরযই নয়, মুসলমান হওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও গণ্য হত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হত না এবং তার সাথে কাফিরের অনুরূপ ব্যবহার করা হত। সূরা নিসার ৮৯ নং আয়াতে অর্থাৎ حَتّٰى يُهَاجِرُوا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা ছিল কালেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কালেমা যেমন ফরয, তেমনি মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কালেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরোক্ত আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসার (৯৮) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবস্থান করছিল, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ থেকে فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরোক্ত আদেশ রহিত হয়ে যায়। কারণ, তখন মক্কা স্বয়ং দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন এই মর্মে আদেশ জারি করেন ঃ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অর্থাৎ মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কোরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরয হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফিকাহ্‌বিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাস'আলা চয়ন করেছেন ঃ

মাস'আলা ঃ যে শহর অথবা দেশে ধর্মের ওপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতাসম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব; তবে যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রূপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই পাওয়া না যায়, তাহলে এমতাবস্থায় তার ওযর আইনত গ্রহণীয় হবে।

মাস'আলা ঃ কোন দারুল কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করার স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরয ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্য

দারুল কুফর হওয়া জরুরী নয়, বরং 'দারুল ফিস্‌ক' (পাপাচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে শরীয়তের নির্দেশাবলী অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

হাফেজ ইবনে হজর ফতহুল বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোন ধারাই এর পরিপন্থী নয়। মসনদে আহমাদে আবূ ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতেও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ البلاد بلاد الله والعباد عباد الله حيثما اصبت خيرا فاقم—অর্থাৎ সব নগরীই আল্লাহ্‌র নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহ্‌র বান্দা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর।---(ইবনে কাসীর)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপক হারে গোনাহ ও অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোন শহরে তোমাকে গোনাহ্ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।----(ইবনে কাসীর)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۭ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ
الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝
لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۣ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا
جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ۝ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۗءَهٗ ۭ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ
اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(৬৪) এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত। (৬৫) তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার

করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে। (৬৬) যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে ডুবে থাকে। সত্বরই তারা জানতে পারবে। (৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যারা আছে, তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকার করবে? (৬৮) যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার চাইতে অধিক বে-ইনসাফ আর কে? (৬৯) যারা আমার জন্য অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের চিন্তাভাবনা না করার কারণ দুনিয়ার কর্মব্যস্ততা। অথচ) এই পার্থিব জীবন, (যার এত কর্মব্যস্ততা প্রকৃতপক্ষে) ক্রীড়াকৌতুক বৈ কিছুই নয়। পর জগতই প্রকৃত জীবন। (দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং পরকাল অক্ষয়; এ থেকে উভয় বিষয়বস্তু পরিস্ফুট। সুতরাং অক্ষয়কে বিস্মৃত হয়ে ধ্বংসশীলের মধ্যে এতটুকু মগ্নতা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।) যদি তারা এ সম্পর্কে (যথেষ্ট) জানত, তবে এরূপ করত না। (অর্থাৎ ধ্বংসশীলের মধ্যে মগ্ন হয়ে চিরস্থায়ীকে বিস্মৃত হত না; বরং তারা চিন্তা-ভাবনা করে বিশ্বাস স্থাপন করত; যেমন তারা স্বয়ং স্বীকার করে যে, জগৎ সৃষ্টি ও একে স্থায়ী রাখার কাজে আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই।) অতঃপর (তাদের এই স্বীকা-রোক্তি অনুযায়ী খোদায়ীতে ও ইবাদতে তাকেই একক (মেনে নেওয়া ও তা প্রকাশ করা উচিত ছিল। সেমতে) যখন তারা নৌকায় আরোহণ করে (এবং নৌকা টালমাটাল করতে থাকে) তখন একাগ্রচিত্তে একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ডাকতে থাকে।

لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ (اى الموحدين)

এতে খোদায়ী ক্ষমতা ও উপাস্যতায়ও তওহীদের স্বীকারোক্তি রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার মগ্নতার কারণে এই অবস্থা তেমন টেকসই হল না। সেমতে) অতঃপর যখন তাদেরকে (বিপদ থেকে) উদ্ধার করে স্থলের দিকে নিয়ে আসে, তখন অনতিবিলম্বেই তারা শিরক করতে থাকে। এর সারমর্ম এই যে, আমি যে নিয়ামত (মুক্তি ইত্যাদি) তাদেরকে দিয়েছি তাকে অস্বীকার করে। তারা (শিরক বিশ্বাস ও পাপাচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে) আরও কিছুকাল ভোগবিলাসে মত্ত থাকুক। সত্বরই তারা সব খবর জানতে পারবে। (এখন দুনিয়ায় মগ্নতার কারণে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তওহীদের পথে তাদের এক অন্তরায় তো হচ্ছে এই মগ্নতা। দ্বিতীয় অন্তরায় হচ্ছে তাদের আবিষ্কৃত একটি অযৌক্তিক